Rajshahi University journal of arts & law Vol. 48 (2020) pp. 97-105
ISSN 2309-0898

উৎপল দত্তের নাটক *টিনের তলোয়ার* : স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ

মো. ইমরুল আসাদ*

Abstract

A writer usually presents his dream or vision of life in a piece of writing. The playwrights or the novelists weave dreams around the realities they are exposed to and these find expressions in their writings. But whether their visions are authentically and realistically portrayed in the plot and through the characters, incidents or episodes in their writings needs an examination. *Tiner Tolowar* is an artistic representation of the dream of Utpal Dutt's theatre and about the breaking of the dreams into an agonized realization of the reality that shatters his dreams. In the *Tiner Tolowar* the battle that unfolds in the theatre is a unique myth of how many dreams were woven but not fulfilled. The play shows how the theatre that has given a new person the honour, identity, and courage to dream ultimately has thrown him into the depth of despair over time, and in that humility, he has taken a new vow to fulfill his dream again. In such a way, the play dramatizes the recurrent pattern of dream, loss of dream and, having new dreams in life. This paper presents the picture of such struggle by some characters in *Tiner Tolowar* by famous plalywright and actor Utpal Dutt.

চাবিশব্দ : *টিনের তলোয়ার*, চরিত্রের স্বপ্নের রসদ, চরিত্রের স্বপ্ন, চরিত্রের স্বপ্ন ভঙ্গের কারণ।

স্বভাবতই মানুষ অনুকরণ প্রিয়। অনুকরণের এই প্রবৃত্তিই নাটকের জন্ম দিয়েছে। এই প্রবৃত্তি আদিম যুগের মানুষের আচরণ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত লক্ষণীয়। যুগে-যুগে মানুষের অনুকরণ প্রবৃত্তির উপর ভর করে সৃষ্টি হয়েছে পূর্ণাঙ্গ নাটক। জীবনের বিচিত্ররূপের সমন্বয় করেছে নাটক। বিভিন্ন কলা থেকে নাটক শুধু এই একটি কারণে আলাদা। নাটক শুধু পাঠ্যই নয় তার শিল্পমূল্য নির্ভর করে অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপ্য শিল্পের উপর। ফলে এই শিল্প উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজন হয় নাট্যকার, প্রযোজক, অভিনেতা, নির্দেশক ও দর্শকের আন্তরিক সহযোগিতা। সবার শ্রম একত্রিত করে যখন কোন শিল্পের সৃষ্টি হয় তখন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন প্রশ্নাতীত। আচার্য ভরতমুনি বলেন, 'ন তজ্ জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা। ন স যোগো ন তৎকর্ম নাট্যেহস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে।'[১] অর্থাৎ এমন কোন জ্ঞান, শিল্প ও কলা, বিদ্যা, যোগ বা কর্ম নেই যা এই নাট্যে দৃষ্ট হয় না। অতএব বলতে দ্বিধা নেই যে, 'এই নাটক হল মিশ্রচারুকলা (Composite Arts)।'[২] নাটক পূর্বে শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের জন্য উদ্ভূত হলেও পরে তা ধর্মচর্চার কাজেও ব্যবহৃত হয়। ধর্মীয় চর্চার মাধ্যমে নাটক পাড়ি দিয়েছে হাজার বছর। তারপর ধর্মচর্চা কিংবা বিনোদনের জন্য শুধুমাত্র ব্যবহৃত না হয়ে চারদিকের বিভিন্ন রকম সমস্যা, সামাজিক অবক্ষয়, অনিয়ম, নীতি, প্রেম ও রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। নানা ধরনের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ শুরু করে নাটক। আনন্দদানের সাথে সাথে গণচেতনায় উদ্বুদ্ধকরণে সক্রিয় হয়ে উঠলো। তারই ধারাবাহিকতায় নাট্যকার উৎপল দত্ত লিখলেন নাটক— *টিনের তলোয়ার*।

বিংশ শতাব্দীর *টিনের তলোয়ার* হাজির হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতা নিয়ে। নাটকের শুরু থেকেই বিভিন্ন বাস্তবতা হাজির হয় একের পর এক। একজন মেথর যখন প্রথমেই বেণীমাধবকে বলে যে, সে থিয়েটার দেখে না তখনই থিয়েটারের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

* এম.ফিল গবেষক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, ই-মেইল: tuhinimrul.ru@gmail.com

ধারণা আরও স্পষ্টতর হয় যখন প্রিয়নাথের মতো মেধাবী নাট্যকার নাটক ছেড়ে ঘোড়ার আস্তাবলে আর ময়নার মতো অভিনেত্রী অভিনয় ছেড়ে বীরকৃষ্ণের মতো লোকের ঘরে যেতে বাধ্য হয়। যখন ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে কিছু বড়লোক বাবু থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতার নামে শিল্পীবৃন্দকে দাস মনে করেছে ঠিক তখনই সামাজিক ভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে থিয়েটারের মান। অথচ বাংলা নাট্যশালায় যে থিয়েটার চর্চা হতো তা ভারতীয় স্বাদেশিকতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে।

> আইনজ্ঞ জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজতোষণ দেশের সমকালীন পরিস্থিতিতে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। জগদানন্দকে বিদ্রুপ করে গ্রেট ন্যাশনাল 'গজদানন্দ' নাটকের অভিনয় করে। তাতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে বাংলার রঙ্গমঞ্চ। তাদের কণ্ঠরোধ করতে ইংরেজ সরকার Dramatic Performance Act. (1876) জারি করে। সেদিনের উত্তেজিত রাজনৈতিক আবহের প্রেক্ষিতে উৎপল দত্তের 'টিনের তালোয়ার' নাটকটি রচিত।[৩]

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের সমালোচনা ও নাট্যশিল্পীদের স্বপ্নের জাহাজে আঘাতের যে চিত্র নাটকটিতে উঠে এসেছে তা কি নাট্যকারের শুধু কল্পনা ছিল? না বাস্তব কোন চিত্রের প্রতিফলন ছিল? নাটকের চরিত্রসমূহের কী কী স্বপ্ন ছিল? চরিত্রের স্বপ্নের সাথে সমকালীন কী কী স্বপ্ন কিংবা স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান পরিলক্ষিত হয়েছে এই নাটকে? অন্বেষণের আগ্রহ বাড়ে।

স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ

টিনের তলোয়ার নাটকের প্রধান চরিত্র বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় গ্রেট বেঙ্গল অপেরার কাপ্তেনবাবু। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাটক যে সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল এবং নাট্যশিল্পীদের টিকে থাকার জন্য যে নিদারুণ যুদ্ধ করতে হয়েছিল তার অন্যতম দৃষ্টান্ত বেণীমাধব। বেণীমাধবের স্বপ্ন গড়ে উঠেছে শুধুমাত্র রঙ্গমঞ্চকে ঘিরে। নিজে হতে চেয়েছেন অভিনেতা, হতে চেয়েছেন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা। সেই স্বপ্ন থেকেই 'বেঙ্গল অপেরা'র সামগ্রিক দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছেন একা। নাট্যজীবনে তার বিবর্তনের কথা মেথরের কাছে তুলে ধরেছেন— প্রথমে যাত্রায় গান গাইতেন, পরে কোটালের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এরপর ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছেন 'বাংলার গ্যারিক'। মূলত, বেণীমাধবের মধ্যে অভিনেতা ও নির্দেশক গিরিশ ঘোষের ছায়া লক্ষণীয়। বেণীবাবুর আরেকটি বড় স্বপ্ন ছিল থিয়েটারে অভিনেত্রী গড়ে তোলা। 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র থেকে রামগতি ন্যায়রত্নরা রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের সক্রিয় ভূমিকায় অভিনেত্রী নিয়োগ করা হয়েছে।'[৪] সেই ইতিহাসই বেণীমাধব চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠে। বেণীমাধব নিচুজাতের ময়নাকে তুলে নিয়ে এসে মঞ্চের অভিনেত্রীরূপে গড়ে তুলেছেন। শুধু ময়নাই নয়, তুলে এনেছেন বসুন্ধরাকেও। 'এ বসুন্ধরা আসলে ছিল সোনাগাছি অঞ্চলের পতিতা।'[৫] বেনীমাধব যখন কোন নাটকে মগ্ন থেকে সংলাপ বলতে থাকেন তখন তার পাশে ভরসার মশাল হাতে সঙ্গ (কোএ্যাক্টিং) দেয়ার জন্য বসুন্ধরা এক সংগ্রামী থিয়েটার কর্মী হয়ে ওঠেন। আবার ময়না যখন গান গাইতে গাইতে স্টেজের উপর দিয়ে চলে যায় তখন যেন ময়না শুধু স্টেজে হাঁটে না, হাঁটে বেণীমাধবের বসন্তকালীন স্বপ্নালোকে। বেণীর সংলাপেই তা পাওয়া যায়— 'এ কার কণ্ঠস্বর? এ স্বরের কলকল্লোলে অলিকুল উঠিল গুঞ্জরি, অমানিশার বক্ষচিরি উষার চঞ্চল অভিসার, জগতে বসন্ত নামিল হরষে। কে মেয়েছেলেটা?[৬] কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ময়নাকে অভিনেত্রী হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন চাটুজ্যে বেণীমাধব। নাটকের এক পর্যায়ে তিনি বীরকৃষ্ণদাঁ'র হাতে ময়নাকে তুলে দিয়েছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন তার নিজস্ব থিয়েটার হবে। থিয়েটারের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যখন বেণীমাধব *মেঘনাদবধ*

কাব্য আওড়াচ্ছেন তখন মেথর বলে ওঠে— 'জঘন্য'।[৭] মেথরের এই সংলাপেই বেণীমাধবের স্বপ্নভঙ্গ শুরু। এরপর সামনে এগিয়ে দেখা যায় বেণীমাধবসহ পুরো গ্রেট বেঙ্গল অপেরার দুঃখ-দুর্দশার চিত্র। সকল অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে যখন থিয়েটারের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে একাকার হয়ে গেছেন তখন তার স্বপ্নও তৈরি হয়েছিল থিয়েটারকে ঘিরেই। খুব যত্ন নিয়ে তিলতিল করে তিলোত্তমার মতো গড়ে তুলেছিলেন অভিনেত্রী মানদাসুন্দরীকে। কিন্তু *গ্রেট ন্যাশনাল* কর্তৃপক্ষ তাকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে চলে যায় তাদের দলে। বেণীমাধবের স্বপ্নেও ঘটে ব্যবচ্ছেদ। বেণীমাধবের সংলাপে তেমনটিই লক্ষণীয়।

> আর ঐ গ্রেট নেশনেল কি করেছে জানেন? আমাদের একট্রেস মানদা-সুন্দরীকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে। গেরান জুরিতে এবডাকশনের কেস হয়। ঐ মানদাকে আমি গড়েছি নিজের হাতে। ছিল সোনাগাছির বেশ্যা। আমি তাকে নীলদর্পণে ক্ষেত্রমণি সাজাই। তিলতিল করি ক্রমে প্রস্ফুটিত কুসুমসম প্রকাশিল তিলোত্তমা। আর বেটি আজ গ্রেট নেশনেলে চলে গেল ড্যাঙস ড্যাঙস করে। এদিকে ময়ূরবাহন নাটক নামাই কি করে? অনুরাধার পার্টটা লেবে কে?[৮]

এছাড়াও থিয়েটার বাঁচিয়ে রাখতে বেণীমাধবকে বীরকৃষ্ণদাঁর কথামতো চলতে হয়েছে। বীরকৃষ্ণ যখন থিয়েটারে লাভ হচ্ছে না বলে থিয়েটার বন্ধ করে দিতে চায় তখন বেণীমাধব খুবই হতাশ হয়ে পড়েন। এমন সময় তিনি সবজিওয়ালী ময়নাকে শঙ্করী বানিয়ে বীরকৃষ্ণকে লোভ দেখিয়ে থিয়েটারের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখেন। বীরকৃষ্ণর হাতে ময়নাকে তুলে দিয়ে যখন থিয়েটারের স্বপ্ন দেখছেন বেণী তখন বসুন্ধরা তিরস্কার করে বলে, 'তুমি থিয়েটার খুলছো না, খুলতে যাচ্ছো গদি, দোকান, দালালের আপিস। সেখানে ময়নার সতীত্ব বিক্রী হবে।'[৯] আবার থিয়েটার রক্ষার চেষ্টায় ইংরেজ শাসকের ভয়ে যখন নাটক পরিবর্তন করতে হচ্ছে তখন ময়না বলে, 'আমাকে বেচে দিয়েছিলে থেটারের জন্য। এখন থেটারকে বেচে দিচ্ছ কার জন্য?'[১০] এমন স্বপ্নের টানাপোড়েন রয়েছে পুরো নাটক জুড়ে। তবে বেণীমাধবকে নাটকের শেষে পরাজিত চরিত্রে রূপ দেননি নাট্যকার। দেখা যায়, সারা জীবন অপমান আর লাঞ্ছনা পেয়ে গেলেও ধনী বাবুদের মুখোশ টেনে খুলে ফেলেছে বেণীবাবু। 'পত্র-পত্রিকার বিরূপ সমালোচনা, বহুবাচস্পতি শিরোমণি, বহু রাজা-মহারাজার শত পদাঘাতে জর্জরিত হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়নি।'[১১] তাই হয়তো নাট্যকার ভঙ্গুর স্বপ্নের মাঝে সৃষ্টির রশদ খুঁজে নিয়ে বেণীমাধব ওরফে কাপ্তেনবাবুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন *টিনের তলোয়ার*। নিচের ছকে বেণীবাবুর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কারণগুলো একনজরে দেখা যাক–

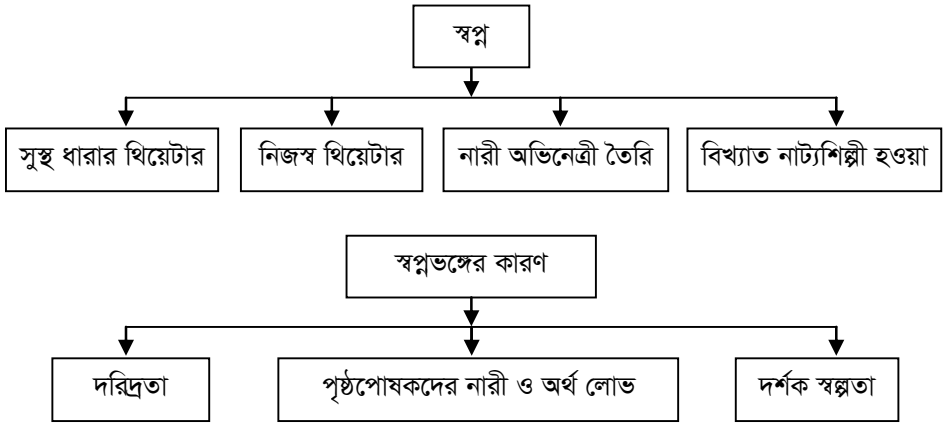

টিনের তলোয়ার নাটকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বসুন্ধরা। গ্রেট বেঙ্গল অপেরার সকল নাট্যশিল্পীর মা এবং অভিভাবক । বেণীমাধবের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহচারিণী। সবার হাতে সময়মতো পাণ্ডুলিপি বিতরণ, দৈনদিন খাওয়া-দাওয়া, সবার খোঁজ রাখা এমন কি নাটক মঞ্চস্থের সময় সবাইকে সাহস দেওয়া তার নিত্যদিনের কাজ। থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসা থেকেই তার এতো কাজের পশরা। অতএব বুঝতে দেরী হয়না যে থিয়েটার নিয়ে তার স্বপ্ন পাহাড়সম। বেণীমাধব তাকে 'আঙুর' বলে ডাকে। বেণীমাধব স্বীকার করেন যে তাঁর দলে অভিনয়টা শুধুমাত্র আঙুরই ভালো জানে। বসুন্ধরা আক্ষরিক অর্থে ঘর করতে পারেনি। ফলে থিয়েটার দলে থিয়েটারের মানুষজনদের নিয়ে যে ঘর গড়ে উঠেছে, সে ঘরেই প্রায় গৃহকর্ত্রীর মতো সকলের দেখভাল করে। ফেলে আসা পতিতাবৃত্তির স্মৃতিকে ভুলে থিয়েটার জীবনে নতুন করে বেঁচে ওঠার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে নিজস্ব থিয়েটারের, যেখানে বীরকৃষ্ণের মতো মুৎসুদ্দিরা থাকবেনা। কিন্তু পাওনাদারের সঙ্গে জীবনের লড়াই তার বন্ধ হয় না। বারবার স্বপ্ন ভেঙে যায়। স্বপ্ন গড়ে, স্বপ্ন ভাঙে। যখন সে জানতে পারে বীরকৃষ্ণ বেণীকে থিয়েটারের মালিকানা দেবে তখন আনন্দে ময়নাকে জড়িয়ে ধরে। হয়তো এতোদিনে তার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। কিন্তু না। তারপরই সে জানতে পারে থিয়েটারের বিনিময়ে ময়নাকে তুলে দিতে হবে বীরকৃষ্ণের কাছে। স্বপ্নের ফোয়ারা যেন নিমিষেই বন্ধ হয়ে যায়। ময়নাকে প্রিয়নাথের সাথে বিয়ে দিয়ে ময়নার ঘর-সংসার দেখার স্বপ্নও যে সে দেখেছিল। একটি সুন্দর থিয়েটার পাবার আশায় শত শত অপমান মুখ বুঝে সহ্য করে যাওয়ার নামই বসুন্ধরা। নাটকের এক পর্যায়ে বাচস্পতি বলে, 'এই এই কক্ষে বাস করে নরাধমের দল।... আর ঐ বেশ্যার নাম আঙুর।'[১২] এই বাক্য নিজ কানে শুনেও কোন ভাবান্তর হয়না আঙুরের। আবার বেণীমাধব যখন তাকে ব্যঙ্গ করে বলে— 'আঙুরের মুখে সতীত্বের কথা শুনে হাসি পাচ্ছে।'[১৩] তখন খুব কষ্ট ও উপলব্ধির সাথে বসুন্ধরা বলে— 'ঐটুকু হাসির অপমান আর গায়েই লাগে না, বুঝলে বাবু? এত লাথি ঝাঁটা খেয়েছি সারাজীবন, ওতে আর আঁচড় লাগে না।'[১৪]

কন্যাসম ময়নাকে নিজের হাতে সুঅভিনেত্রী শঙ্করীতে পরিণত করতে সহায়ক ছিল বসুন্ধরা। বাজারের সবজিওয়ালী ময়নার নোংরা শরীর ঘষামাজা করে পরিস্কার করার দায়িত্ব পড়ে দলের অভিনেত্রী কামিনীর উপর। কিন্তু ময়নাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে বেণীর পাশাপাশি আপ্রাণ চেষ্টা করে যায় বসুন্ধরা। ময়নাকে কীভাবে নতুন নাটকের নায়িকা অনুরাধাতে রূপান্তর করা যায় সেজন্য উঠেপড়ে লাগে বসুন্ধরা। কস্টিউম নির্বাচন করতে, শুদ্ধ উচ্চারণ করতে, সাহসের সাথে সংলাপ দিতে শেখায় বসুন্ধরা। যেন নিজের অভিনয় জীবনের সব সাধ-স্বপ্ন পূর্ণ করতে চায় ময়নার মধ্য দিয়ে। আর সেজন্যই অভিনয়ের প্রথম রাতে নিজে হাতে ধরে মঞ্চে প্রবেশ করায় ময়নাকে। মঞ্চকে প্রণাম করতে বলে। শেখানোর চেষ্টা করে এটি কতটা শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্থান। মঞ্চে এসে ময়না দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়লে তাকে ধমক দিয়ে অভিনয় করতে বলে। আবার ভালো অভিনয় করলে বুকে জড়িয়ে ধরে। দলের অভিজ্ঞ অভিনেতা হরবল্লভ যখন ময়নাকে আশীর্বাদ করে তখন বসুন্ধরা বলে ওঠে, 'ও আমার চেয়ে অনেক ওপরে উঠবে, হরবাবু, অনেক অনেক ওপরে।'[১৫] এই সংলাপে প্রতীয়মান হয় সেখানে নেই ঈর্ষা, নেই কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। 'যেন মনে হয় নিজের ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিকে অস্বীকার করে, অভিনেত্রী বসুন্ধরার জীবনের অপূর্ণ স্বাদ সার্থক হতে চলে ময়নার জীবনে।'[১৬]

পরবর্তীকালে ময়না অভিনয় শিখলেও থিয়েটারে থাকা হয় না। করা হয় না প্রিয়নাথের ঘর। ময়নার জায়গা হয় বীরকৃষ্ণের বাড়িতে। এরই মধ্য দিয়ে ময়নাকে নিয়ে দেখা স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে যায় বসুন্ধরার। এছাড়াও সে স্বপ্ন দেখেছিল একজন ভালো থিয়েটার অভিনেত্রী হওয়ার। তার অভিনয়ের প্রতি নিষ্ঠা, দায়বদ্ধতা ও আন্তরিকতা সবাইকে মুগ্ধ করে। নতুন নাটকের মহড়া করার সময় অন্যরা বসুন্ধরাকে

পাণ্ডুলিপির সাহায্য নিতে বলে। কিন্তু সে জানায় তার সাট-এর দরকার নেই। সাট/পাণ্ডুলিপি ছাড়াই সে নিজের সংলাপ বলে। সংলাপ শেষে দীপ্ত কণ্ঠে বলে— 'পার্ট পেলেই আগে মুখস্থ করবো না?'[১৭] অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন তার ভঙ্গ হয়নি বটে, তবে বেণীমাধবের অসততা তার স্বপ্নের সামনে বার বার দ্বিধা সৃষ্টি করেছে। ছকে দেখা যাক বসুন্ধরার স্বপ্ন ও ভঙ্গের কারণ সমূহ–

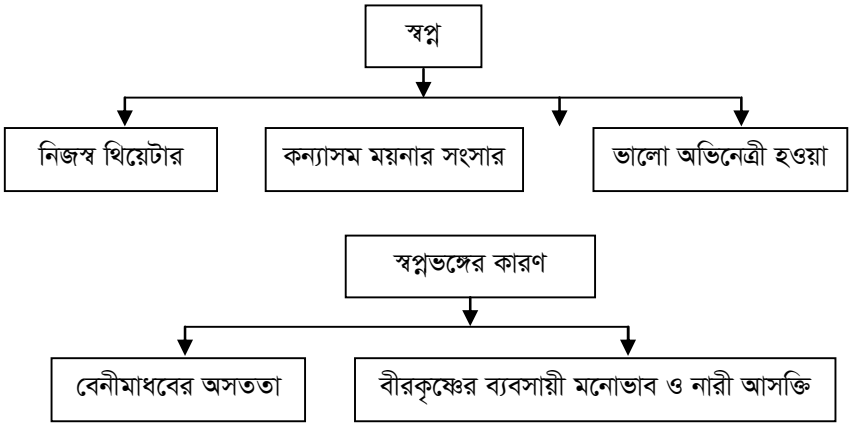

নাটকের অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র ময়না। সে পূর্বে নিচুশ্রেণির একজন মানুষ ছিল। সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের পর যেসব অভিনেত্রী রঙ্গালয়ে প্রবেশাধিকার পায় তাদের সবাই ছিল পতিতাপল্লির বাসিন্দা। কারণ তখনও শিক্ষিত ও ভদ্র ঘরের নারীরা নিষ্ঠা নিয়ে অভিনয়ের জন্য এগিয়ে আসেনি। এ নাটকের ময়না তেমনি একজন। পতিতাপল্লির উল্লেখ পাওয়া যায় না নাটকে। তবে তার জন্মপরিচয় নিচু শ্রেণির। দুর্ভিক্ষে গ্রাম থেকে উৎখাত হয়ে বাঁচার তাড়নায় যুবতী বয়সে আলু-বেগুন বেচে পেট চালায়। কিন্তু তার গানের গলা চমৎকার। অভিনেত্রী হবার স্বপ্নে 'পরনে শতছিন্ন শাড়ী জড়িয়ে শোভাবাজারে গ্রেট বেঙ্গল অপেরার কর্ণধার বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, ওরফে কাপ্তেন বাবু, ওরফে বাংলার গ্যারিকের কাছে এসে উপস্থিত হয়।'[১৮] বেনীমাধব ময়নাকে অভিনেত্রীরূপে গড়ে তুলতে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ময়নার স্বপ্নের পথ প্রসারিত হয। বেণীমাধব তাকে ভদ্রঘরের মেয়ে শঙ্করী রূপে মিথ্যে পরিচয়ে পরিচিত করে তোলেন। ময়নাও স্বপ্ন দেখতে শুরু করে বেণীবাবু ও বসুন্ধরার সাথে একটি স্বাধীন থিয়েটারের, একজন ভালো অভিনেত্রী হওয়ার। কিন্তু ময়না যখন বুঝতে পারলো যে তার স্বাধীনতার বিনিময়েই বেণীমাধব স্বাধীন হতে চাইছেন তখনই তার স্বপ্নে ছেদ পড়ে। তবুও নিজের বিনিময়ে হলেও থিয়েটারের প্রতি শ্রদ্ধাকে বিকিয়ে যেতে দেয়নি ময়না। বীরকৃষ্ণ যখন ময়নার হাতে স্বর্ণের শৃঙ্খল পরায় তখনও থিয়েটারের প্রেমে মগ্ন এই অভিনেত্রী। অভিনয় গুরু বেণীমাধবের প্রতি ক্ষোভ থেকে সে মেঘনাদবধ কাব্য থেকে সংলাপ উচ্চারণ করে— 'ধর্মপথগামী হে রাক্ষসরাজানুরাজ, বিখ্যাত জগতে তুমি। কোন ধর্মমতে, কহদাসে শুনি, জ্ঞাতিত্ত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি সকলি দিলা জলাঞ্জলি?'[১৯]

শুধুমাত্র অভিনেত্রী হিসেবে বেঁচে থাকার যে স্বপ্ন ময়না দেখেছিল তা জলাঞ্জলি দিয়ে থিয়েটার বেঁচে থাকুক সেই স্বপ্ন দেখে গেছে। ময়নার চোখে আরও একটি স্বপ্ন ছিল। প্রিয়নাথের জীবনসঙ্গিনী হওয়া। গ্রেট বেঙ্গল অপেরা প্রিয়নাথের নতুন নাটক 'তিতুমীর' করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেও ইংরেজদের ভয়ে ও বীরকৃষ্ণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে দল থেকে প্রিয়নাথের নাটক ও প্রিয়নাথকে বাদ দেয়া হয় । দল থেকে প্রিয়নাথ চলে গেলে তার সাথে ঘর করার স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় ময়নার। ময়না বীরকৃষ্ণের সাথে থিয়েটারে এসে খোঁজ করে—

ময়না : (চার দিকে দেখে) প্রিয় নেই?
বেনী : না, প্রিয় নেই, শুধু প্রিয়া আছে!
ময়না : ভাবছিলাম দেখা হবে।
বেনী : সে ঘোড়ার আস্তাবলে চাকরি নিয়েছে। দেখা করতে হলে মল ঝমঝম করতে করতে চলে যাও সিঁদুরে পট্টির আস্তাবলে। (একটু পরে) অসংখ্য ঘোড়ার মধ্যে যার মাথায় টুপি দেখবে, সে কিন্তু ঘোড়া নয়, প্রিয়নাথ, এখন মহলা আরম্ভ হবে![২০]

বেনীবাবুর এমন আচরণ ময়নার স্বপ্নকে শেষ করে দেয় চিরদিনের জন্য। ময়নার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ছক —

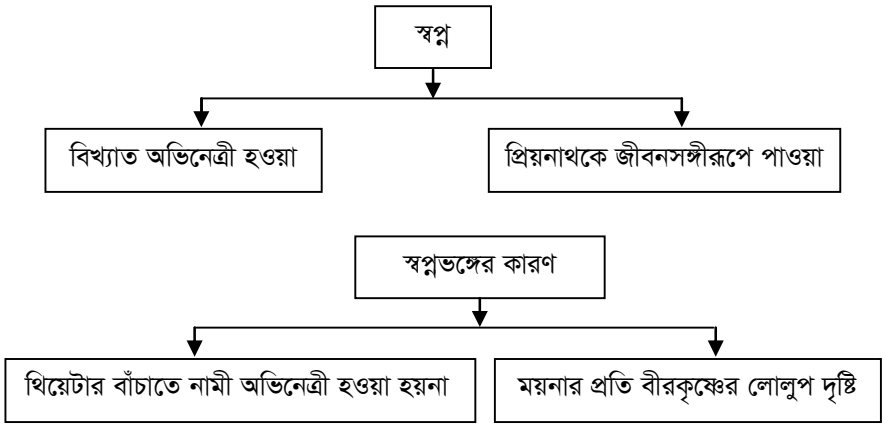

প্রিয়নাথ মল্লিক *টিনের তলোয়ার* নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তাঁর ভিতরে একজন আদর্শ নাট্যকার হওয়ার ব্রত পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও রোমান্টিক নায়ক চরিত্ররূপে প্রিয়নাথকে মনে রাখে পাঠক ও দর্শক। প্রিয়নাথ হিন্দু কলেজের ছাত্র। সে বিখ্যাত কবি ডিরোজিওর শিষ্য। নব্যযুগের নব্য ধারণায় অনুপ্রাণিত এই যুবক পরিবারের নানা ব্যক্তিগত কষ্ট, সমাজের অবক্ষয় দেখে সিদ্ধান্ত নেয় নাটক লিখবে। স্বপ্ন দেখে, হবে এমন একজন নাট্যকার যার দেশমাতৃকার বন্ধনমুক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন চিন্তা থাকবে না। 'নাটককার সমকালীন সমাজের একজন সচেতন ব্যক্তি। তাই তাঁর কাজে সমাজ বাস্তবতার খুঁটিনাটি দিকসমূহ ছাড়াও সমাজের তথা ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণি ও রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান প্রবণতাগুলো উঠে আসে।'[২১]

নাট্যকার উৎপল দত্ত এমন সব বৈশিষ্টের নিরিখে প্রিয়নাথ মল্লিক চরিত্রটিকে করে তুলেছেন সমসাময়িক অনুকরণীয় একটি চরিত্র। প্রিয়নাথ যখন অনেক স্বপ্ন নিয়ে বেণীমাধবকে তার 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকের পাণ্ডুলিপি দিয়ে যায় তখন সে খেয়াল করে যে তার নাটকটিকে গুরুত্বহীন ভাবে নিয়েছে বেনীমাধব। পরপর তিনদিন দলের মহড়া কক্ষে এসে সে সুযোগ পায়না দলের প্রধান বেনীবাবুর সাথে যোগাযোগের। শেষপর্যন্ত হতাশ হয় প্রিয়নাথ। তার বছর ধরে দেহের রক্ত জল করে গবেষণালব্ধ এই নাটকের ছেঁড়াপাতায় তেল মুড়ি খাওয়া হয়েছে। আস্তাকুঁড়ে ফেলে রাখা হয়েছে নাটকের পাণ্ডুলিপি স্বপ্নভঙ্গ হয় প্রিয়নাথ মল্লিকের।

ডিরোজিওর কবিতা আবৃত্তি করে সে আক্ষেপ করে 'তারপর পঞ্চাশ বৎসর কেটে গেছে, কোন বাঞ্চৎ জাগলো না।'[২২] অর্থাৎ দেশের মানুষকে স্বাধীনতা সম্পর্কে সজাগ করার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন প্রিয়নাথ। আর সেই আশা নিয়েই নাটক রচনা করেছেন *তিতুমীর*। *তিতুমীর* ইংরেজদের বিপক্ষে আন্দোলনের

নাটক, কথায় কথায় ইংরেজি বললেও ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে নিজে ও অন্যকে সোচ্চার করার স্বপ্ন দেখেছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সে বলে—

> প্রিয় : আই শ্যাল রাইট! আমি অমৃতবাজার পত্রিকায় পত্র লিখবো! ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনে বক্তৃতা দেব। বলবো- ব্রিটিশ জলদস্যুর অত্যাচারে যখন দেশ গোরস্থানে পরিণত, তখন বাবুগণ হিন্দুয়ানি, মদ, পতিতা, বুলবুলি ও ময়ূরবাহন নাটক লইয়া কালাতিপাত করিতেছেন। (বসে দু'হাতে মুখ গোঁজে) উ :! ইট হ্যাথ মেড মি ম্যাড! [২৩]

কিন্তু প্রিয়নাথের সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। ইংরেজদের নিষেধাজ্ঞায় (Dramatic Performance Act.1876) ভীত হয়ে বেণীমাধব প্রিয়নাথের *তিতুমীর* মঞ্চায়ন না করার সিদ্ধান্ত নেন।

ধনীর ছেলে প্রিয়নাথ বাপের বাবুয়ানি পছন্দ করেনি। ফলে সাধারণ জীবন বেছে নেয়। আর এই উদারনীতি থেকেই প্রেমে পড়ে নিচুশ্রেণির ময়নার। ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। ঠিক তখনই জানতে পারে বীরকৃষ্ণদাঁ ময়নাকে রক্ষিতা করে রাখতে চেয়েছে। রাগে প্রিয়নাথ শিহরিত হয়ে ওঠে। তার ভালোবাসার মানুষটি হবে আরেকজনের রক্ষিতা তা সে মানতে পারেনি। তাই প্রিয়নাথ বেণীমাধবের সামনে চিৎকার করে বলে ওঠে– 'তাই বলে মেয়েটার সতীত্বকে বাজি রেখে পাশা খেলবেন?'[২৪]

আবার বেণীমাধবের উপর রাগ করে যখন ময়নাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে চায় তখন ময়না যেতে রাজি না হলে শেষ চেষ্টা করে এই বলে যে– 'একটা অশিক্ষিত রুচিহীন ব্যাধিগ্রস্থ মুৎসুদ্দির শয্যায় গেলে কোথায় থাকবে তোমার স্বাধীনতা?'[২৫] উক্ত সংলাপে বোঝা যায় ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে, স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রিয়নাথের শেষ আকুতির যন্ত্রণা। তবু স্বপ্ন বাঁচেনা। তাকে চলে যেতে হয় থিয়েটার ছেড়ে, প্রেম ছেড়ে আর ছেড়ে যেতে হয় স্বপ্ন। প্রিয়নাথ মল্লিকের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ছক —

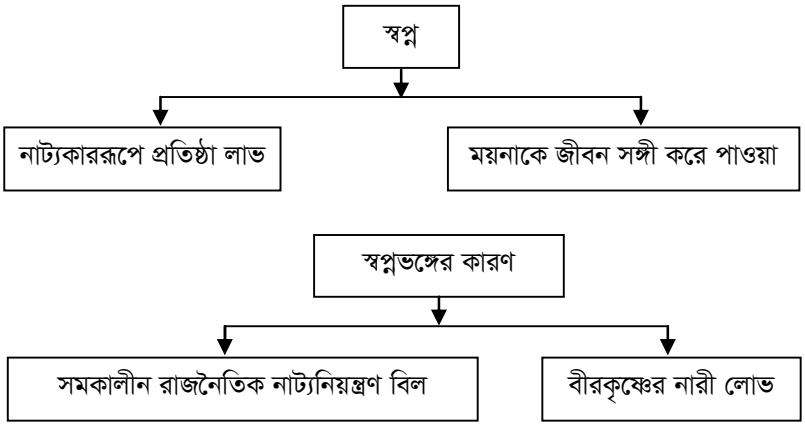

নাটকের শেষদৃশ্যে দেখা যায় শুধু প্রিয়নাথ মল্লিকই নয় একে একে (বেণীমাধব, বসুন্ধরা কিংবা ময়না) সবার স্বপ্নের বীজ বপন করেছেন নাট্যকার উৎপল দত্ত। *তিতুমীর* নাটকের অংশ হিসেবে যদুর মুখে উচ্চারিত হয় মাইকেল মধুসূদনের কবিতা–

> শুন গো ভারতভূমি
> কত নিদ্রা যাবে তুমি
> উঠ ত্যজ ঘুমঘোর
> হইল, হইল ভোর
> দিন কর প্রাচীতে উদয়।[২৬]

ধীরে ধীরে সব অভিনেতা সমবেত কণ্ঠে গানে রূপ দেয় সেই কবিতা। গানের প্রাণ যেন প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি প্রান্তে ধ্বনিত হয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে। সেদিন যেমন স্বপ্ন দেখেছিলো সকল থিয়েটারকর্মী, আজও সেই স্বপ্নের বাইরে নয় তাঁরা। প্রতিনিয়ত স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে থিয়েটারকে ঘিরে, সমাজকে ঘিরে। কখনও স্বপ্নপূরণ হয় আবার কখনও স্বপ্নভঙ্গ হয়। এ দেশের থিয়েটার প্রাঙ্গণেও স্বপ্নগড়া কিংবা স্বপ্নভাঙ্গা নতুন কিছু নয়। গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ এ পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হলো 'প্রাঙ্গণেমোর ছাড়লেন ২৭ সদস্য'[২৭] অর্থাৎ দেশের অন্যতম নাট্যদল *প্রাঙ্গণেমোর* থেকে ২৭ জন সদস্য দল ছেড়ে দিয়েছেন। তাতে করে যেমন *প্রাঙ্গণেমোর* নাট্যদলের স্বপ্নভঙ্গ হলো, তেমন কয়েকদিন পরেই ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ এ পত্রিকায় ছাপা হলো 'ঢাকার মঞ্চে নতুন নাটদল থিয়েটারিয়ান।'[২৮] পত্রিকার পাতা থেকেই জানা যায় *প্রাঙ্গণেমোরের ঐ* ২৭ জনই *থিয়েটারিয়ান* নামক নতুন দলটি গঠন করলেন। অর্থাৎ *থিয়েটারিয়ান* দলটি নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করলো। এছাড়াও ২৬ জুলাই ২০১৯ এ পত্রিকায় দেখা যায় 'পুরোনো মুখ নিয়ে, নতুন নাটকের দল'[২৯] অর্থাৎ *থিয়েটার আর্ট ইউনিট* ছেড়ে *অনুস্বর* নামে নতুন দল গঠন করলো কয়েকজন সদস্য। একই দলে আবার অনেক ভাঙ্গাগড়ার খবর রয়েছে। ১৯৯২ সালে *পদাতিক* থেকে বের হয়ে এসে *অন্যদল* নামে দল তৈরি করেন এস এম সোলায়মান ও মোহাম্মদ বারী। ১৯৯২ সালের ২২ অক্টোবর তাঁরা দুইজনই *থিয়েটার আর্ট* নামে দল গঠন করেন। কিছুদিন পর *থিয়েটার আর্ট ইউনিট* নামে কার্যক্রম শুরু করেন। এই ভাঙ্গাগড়ার মাঝেও প্রতিটি নাট্যদল যেমন স্বপ্ন দেখেছে থিয়েটার নিয়ে, স্বপ্ন দেখেছে দেশকে নিয়ে। কখনো কখনো স্বপ্নভঙ্গও হয়েছে। ভগ্ন স্বপ্নের মাঝে আবার স্বপ্ন দেখেছে। তেমন নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর চিত্রিত চরিত্রসমূহের মধ্য দিয়ে থিয়েটারের কল্যাণসাধনেরই স্বপ্ন দেখেছেন ।

নাটকের শেষদৃশ্যে নাট্যকার নতুন ভোরের স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন। শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যেন বাংলার মানুষের হৃদয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। স্বপ্ন দেখাতে চেয়েছেন প্রতিকূল পরিবেশে অন্তরে কী করে দেশপ্রেমকে লালন করতে হয় । নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন দেশ-কাল-পাত্র কোথাও শিল্পীর কখনও মৃত্যু হয় না। শিল্পী অমর। স্বাধীনতার জন্য মানুষ যে পরিশ্রম করেছিল তার শতশত বছর পরেও একইরকম লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার চেতনা যেন এই নাটকে বিদ্যমান। নাটকের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে মনে হয় চরম হতাশা ও ভগ্ন স্বপ্নের ভিতরেই নাট্যকার খুঁজতে চেয়েছেন সুন্দর স্বপ্নের রসদ। উৎপল দত্তের এই স্বপ্নগুলোকে Thesis হিসেবে আর স্বপ্নভঙ্গকে Antithesis হিসেবে আখ্যায়িত করলে বেণীমাধবের অভিনয়ের মাধ্যমে দীনবন্ধুর সধবার একাদশী থেকে প্রিয়নাথের তিতুমীরে পর্দাপনপর্বকে Synthesis রূপে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। কিন্তু এই আখ্যানের মধ্য দিয়ে যদি বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হয় তবে সেখানেই জীবনের প্রাপ্তি, শিল্পের প্রাপ্তি। *টিনের তলোয়ার* যেন সেই বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যেই নির্মিত অস্ত্র। তাই নাটকের চরিত্র মথুরের কথার উত্তর দিতেই হয়। *টিনের তলোয়ার* ছেলেমানুষি করার জন্য নয়, স্বপ্ন বাস্তবায়নের এক বড় হাতিয়ার।

তথ্যসূত্র

[১] ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ভরত *নাট্যশাস্ত্র*, (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, মার্চ ১৯৮০), পৃ. ২২৩।

[২] ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ব বিচার*, (কলকাতা: করুনা প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ১৭।

[৩] রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "উৎপল দত্ত: টিনের তলোয়ার", তপন মণ্ডল (সম্পাদিত), উৎ*পল দত্তের টিনের তলোয়ার*, (কলকাতা: দিয়া পাবলিকেশন, ২০১৬), পৃ. ৩৪।

[৪] তদেব, পৃ. ৪৫।

[৫] তদেব, পৃ. ৪৫।

[৬] উৎপল দত্ত, *নাটক সমগ্র* (পঞ্চম খণ্ড), (কলকাতা: মিত্রা ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৯৭), পৃ. ৮০।

[৭] তদেব, পৃ. ৭৮।

[৮] তদেব, পৃ. ৭৯।

[৯] তদেব, পৃ. ১২৭।

[১০] তদেব, পৃ. ১৩৪।

[১১] দর্শন চৌধুরী, *টিনের তলোয়ার নিয়ে*, (কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ২০১০), পৃ. ১১৮।

[১২] উৎপল দত্ত, *নাটক সমগ্র* (পঞ্চম খণ্ড), (কলকাতা: মিত্রা ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৯৭), পৃ. ৯৭।

[১৩] তদেব, পৃ. ১২৭।

[১৪] তদেব, পৃ. ১২৭।

[১৫] তদেব, পৃ. ১০৫।

[১৬] দর্শন চৌধুরী, *টিনের তলোয়ার নিয়ে*, (কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ২০১০), পৃ. ১৪১।

[১৭] উৎপল দত্ত, *নাটক সমগ্র* (পঞ্চম খণ্ড), (কলকাতা: মিত্রা ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৯৭), পৃ. ৮৭।

[১৮] কুন্তল মুখোপাধ্যায়, উৎ*পল দত্তের টিনের তলোয়ার একটি ভাষ্য*, (কলকাতা: রত্নাবলী, ২০১৫), পৃ. ৭৭।

[১৯] উৎপল দত্ত, *নাটক সমগ্র* (পঞ্চম খণ্ড), (কলকাতা: মিত্রা ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৯৭), পৃ. ১২৯-১৩০।

[২০] তদেব, পৃ. ১৩২।

[২১] সাজেদুল আউয়াল, *বাংলা নাটকে নারী-পুরুষ ও সমাজ*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫), পৃ. ২৩।

[২২] উৎপল দত্ত, *নাটক সমগ্র* (পঞ্চম খণ্ড), (কলকাতা: মিত্রা ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৯৭), পৃ. ১২৯-১২০।

[২৩] তদেব, পৃ. ১২০।

[২৪] তদেব, পৃ. ১২৭।

[২৫] তদেব, পৃ. ১২৯।

[২৬] তদেব, পৃ. ১৪১।

[২৭] মতিউর রহমান (সম্পাদিত), *প্রথম আলো*, (ঢাকা: ১৩ ডিসেম্বর ২০২০), পৃ. ১৪

[২৮] সাইফুল আলম(সম্পাদিত), *যুগান্তর*, (ঢাকা: ১৭ ডিসেম্বর ২০২০), পৃ. ১১

[২৯] মতিউর রহমান (সম্পাদিত), *প্রথম আলো*, (ঢাকা: ১৯ জুলাই ২০১৯), পৃ. ১৪